Marc ট্রেনে মা- দুর্গার সঙ্গে

পীযূষ ঘোষ (অক্টোবর, ২০১০)

সোমবার সকাল, এমনিতেই ঘুম ভাঙতে চাইনা, তার ওপর আগের রাতে ঘড়ির অ্যালার্মটা দিতে ভুলে গেছি। হুড়োহুড়ি করে বাড়ি থেকে যখন বেরোলাম তখন প্রায় সাতটা। মার্ক ট্রেনটা বল্‌টিমোর পেন্‌স্টেশন থেকে ছাড়ে ঠিক সাড়ে সাতটায়। বাড়ির থেকে বেরিয়ে একটা বাস ধরে পেন্‌স্টেশন অবধি যেতে হবে। বাসটা পেয়েও গেলাম যাইহোক ঠিক সময়ে। গতকাল সন্ধ্যে বেলায় দেশে মহালয়া হয়ে গেলো। তার পর থেকেই মনটাতে কেমন একটা পূজো পূজো ভাব। অফিস যাবার একটুও ইচ্ছে নেই। যাইহোক, বাসে বসে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের চন্ডীপাঠের কথা ভাবতে ভাবতে পৌঁছে গেলাম পেন্‌স্টেশনে। সাতটা পঁচিশ, পা চালিয়ে ট্রেনের গেট বন্ধ হবার আগেই উঠলাম ট্রেনে। এগিয়ে গিয়ে জানালার ধারে একটা সিটে বসলাম। এই মার্ক ট্রেনে কলকাতার মেট্রোর মত অত ভীড় হয়না, তাই বেশ আরামেই যাওয়া যায়। ট্রেন ছাড়ে ঠিক সাড়ে-সাতটায়। মোবাইলটা ভাইব্রেশনে দিয়ে জলের বোতলটা বের করে বসলাম। দু- একটা স্টেশন পেরিয়ে গেল। চোখটাও কেমন একটু ছোটো হয়ে আসে। হঠাৎ দেখি আমার উলটো দিকে এক মাঝ বয়সি ভদ্রমহিলা বসে। ভারতীয়, সে ব্যপারে কোনো সন্দেহ নেই। মাঝ বয়সি হলেও বেশ সুন্দরি। পরনে একটা লালাভ বেনারসী, লম্বা কুচ্‌কুচে কালো চুল। কপালে একটা লাল টিপ। গলায় ছোটো বড় দু তিনটে হার। পুরো ব্যপারটাতে কিরকম একটা বাঙালি বাঙালি গন্ধ। ভদ্রমহিলার এরকম জাঁকজমক সাজ দেখে আশ্চর্য্যও হোলাম আবার কিরকম ঘাবড়েও গেলাম। পরিচয় করার একটা লোভ হতে লাগলো। লোকজনও বেশ একটা নেই। প্রয়োজনীয় সাহস সঞ্চয় করে বললাম,

“হ্যালো, হাও আর ইউ ?”

“আপনি তো ইউনিয়ন স্টেশন পর্যন্ত যাবেন, তাইনা !” পরিষ্কার বাঙলাতে আমায় জিজ্ঞেস করলেন। আমি কিরকম হতচকিত হয়ে গেলাম। কি করে উনি জানলেন আমি বাঙালি। নিজের চেহারা, পোশাক আশাকে একটু চোখ বুলিয়ে নিলাম, বোঝার চেষ্টা করলাম আমার চেহারার মধ্যে কোথাও কোনো বাঙালিয়ানার ছাপ আছে কিনা। সে তো না হয় গেলো, কিন্তু উনি কি করে জানলেন আমি ইউনিয়ন স্টেশন পর্যন্ত যাবো। মনের মধ্যে প্রশ্ন গুলো ঘুরপাক খেতে লাগলো। বাঙলাতেই প্রথম কয়েক মিনিট মেঘ আবহাওয়া এই সব নিয়ে টুকিটাকি কথা হোলো। এত বছর অ্যামেরিকাতে আছি ঠিকি কিন্তু খাবার আর কথা বলার সময় এলে জিবটা কিরকম বাঙলাকেই আঁকড়ে ধরতে চাই।

“এই দেখুন বলতেই ভুলে গেছি, আমার নাম পীযূষ ঘোষ, আমি থাকি বলটিমোরে”

“ঠিক তাই, কথায় কথায় পরিচয়টাই দেওয়া হয়নি, আমি দুর্গা”

মনে মনে ভাবলাম একি সেকেলে গেঁয়ো নাম রে বাবা। এও ভাবলাম কোনো ভদ্রতা জানেনা, পদবিটাতো বলবে নাকি, এমন ভাব দেখাচ্ছেন জেনো উনি শেক্সপিয়র বা নিউটন, এক নামেই সবাই চেনে। জানালার দিক থেকে চোখ সরিয়ে একটু অপ্রসন্ন দৃষ্টিতেই তার দিকে তাকালাম। তারপর যা দেখলাম তা দেখে আমার চক্ষু ছানাবড়া। দেখি উনার পেছনে আরো কয়েকটা হাত, হাতে নানান অস্ত্র। এতো মা দূর্গা। নিজের

চোখটা দুয়েকবার ঘোঁষে নিলাম, কয়েক সেকেন্ড পরেই দেখি পেছোনের হাতগুলো মিলিয়ে গেলো। আমারতো অবস্থা খারাপ, ঘাম দিতে শুরু করলো। ভেতরে কিরকম একটা আশ্চর্য ধরনের আনন্দও হতে লাগলো। চেঁচিয়ে দুয়েকবার যে 'মা' 'মা' বলে মনটা হালকা করবো তারও উপায় নেই। এদিকে কি বলে যে সম্মোধন করবো সেটাও ঠিক মাথায় আসছে না। উনি আমার অবস্থাটা আন্দাজ করে নিজেই ধিরে সুস্থে কথা শুরু করলেন। বললেন-

"তোমরা বাঙালিরা তো অ্যামেরিকায় সবাইকে দিদি বলে ডাকো, আমাকেও দিদি বলো" কিছুটা যেন স্বস্তি পেলাম। জিজ্ঞেস করলাম

"দিদি তা আপনি এখানে, মানে কি ভাবে ..."

"কালকে বাঙলা- ই মহালয়াটা সেরেই এয়ার ইন্ডিয়ার ডাইরেক্ট ফ্লাইটা ধরে নিউ ইয়র্ক থেকে বি ডব্লুআই এসেছি।" প্রায় দু- তিনটে স্টেশন মাঝে পেরিয়ে গেলো, টুক্‌টুক্‌করে অনেক কথাও হোলো। খুব ধিরে ধিরে কথা বলেন উনি, মুখে একটা আলতো হাসি। ওই পোশাক আর সাজের সঙ্গে অমন সুন্দর একটা হাসি কি সুন্দর- ই যে লাগছিলো কি বলবো। ইচ্ছে হচ্ছিলো দূরে বসে থাকা সাহেবটাকে দেখিয়ে বলি 'দেখ এরকম সুন্দরি তোদের কেউ আছে'। যাইহোক, এটা ওটা কথা বলতে বলতে পশ্চিমবঙ্গের প্রসঙ্গ উঠে এলো, বিশেষ করে কয়েক ঘন্টা আগেই উনি ঘুরে এসেছেন ওখান থেকে। আমার ওই ইন্টারনেটে পড়া আনন্দবাজার আর মামা- মাসির কাছে ফোনে শোনা সীমিত জ্ঞান থেকেই কথাবার্তা শুরু করলাম। এদিকে পশ্চিমবঙ্গের কথা উঠতেই দেখলাম উনি কিরকম গুটিয়ে গেলেন, একটু যেন বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। শুকনো গলায় বললেন-

"পারলাম না ভাই, অনেক চেষ্টা করেছি, কিছুতেই কিছু হচ্ছেনা। আমার ছেলে পুলেরা কেউ ঠিক ঠাক কাজই করছেনা" বলতে বলতে দিদি একটা রুমাল বের করলেন ব্যগ থেকে। আমি বুঝতে পারলাম দেশের অভ্যেস, রাস্তায় ধুলো বালি, সেই প্রসঙ্গ টেনে আমি বললাম-

"দিদি সত্যি পশ্চিমবঙ্গের শহরগুলোতে এখন যা কালি ধূলো নোংরা রুমাল ছাড়া খুব মুশকিল"

"আর বোলোনা, আমার কতু- টার যে কি হয়েছে কে জানে, এসব পরিবেশের দিকে ওর আজকাল কোনো মন- ই নেই। বলে ক্রিকেটার হবো, ক্রিকেটি নাকি তার জীবন, নইলে সে প্রান দেবে" একটু দেরিতে হলেও বুঝলাম কার্ত্তিকের কথা বলছেন। উনি বলে গেলেন-

"মাঠে মোট একশোটা রান করতে পারলো না অথচ ইতিমধ্যে সাত- আটবার বেটিং কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করলে বলে বড় প্লেয়াররা নাকি মাঠের বাইরেই ভালো খেলে। এই মন্দা রিসেস্‌নের বাজারেও ওদের বেটিং ব্যবসা রমরমা।"

"দিদি, পেপারে পড়লাম এই রিসেস্‌নে কলকাতার বেশ কিছু বড় বাঙালি ব্যবসায়ী মার খেয়েছে, আর বাঙালি আরও নাকি ব্যবসা বিমুখ হয়ে পড়ছে"

"তা হবেনা !" এবার কিরকম একটা রাগ লক্ষ্য করলাম উনার স্বরে।

"গনেশটার ওপরেই তো এই ভালো মন্দের ভারটা ছিলো, তা সব ছেড়ে দিয়ে উনার মাথায় ঝোঁক চেপেছে সফট্‌ওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হবেন। আজকালকার সব ছেলে, কিছু বলার জো আছে, বলে ওর মত মোটা মাথা আর বড় ভূঁড়ি দিয়ে নাকি এর বেশি কিছু হওয়া যায় না। আর তাছাড়া কম্পিউটার কিনলে মাউসের

পয়সাটাও নাকি বেঁচে যাবে তাই ওটাই ওর পক্ষে ভাল। এই তো অবস্থা, কি করে বাঙলায় ব্যবসার উন্নতি হবে তুমিই বলো ভাই" আমি মনে মনে ভাবলাম ঠিকি, এই দিকটা তো ভেবে দেখিনি। প্রসঙ্গটা পাল্টানোর চেষ্টা করলাম-

"এতদিন ধরে চাকরির বাজারে এই অবস্থা তার পর আবার পূজোর আগে এবছর সারা বাঙলা জুড়ে অনাবৃষ্টি, খরা চাষিরা আত্মহত্যা করছে, মাঠে ধান নেই, কি যে হবে কে জানে"

"লক্ষিটার যদি কোনো কান্ড জ্ঞান থাকে, ওই তো ছিলো এই সবের দায়িত্যে। মতিভ্রম ভাই মতিভ্রম, ওসব ভুলে গিয়ে এখন রাজনিতীতে যোগ দিয়েছে। মাঝে মাঝেই পতাকা হাতে ধর্মতলায় দেখা যায়। সে নাকি বাংলার রঙ পরিবর্তন করতে চাই। যা ইচ্ছে করুক, আমি আর কত বলি। আসলে পেটে পড়াশুনা না থাকলে, শিক্ষা না থাকলে যা হয়, ইস্কুলে তো আর গেলোই না"। কথায় কথায় দুজনেই কি রকম চিন্তিত হয়ে পড়েছি। সেই চিন্তার রেশ নিয়েই বললাম-

"দেখো দিদি, লেখাপড়ার কথা বলছো, এই লেখাপড়াতে আমরা প্রাক- স্বাধিনতা আমলে সবার আগে ছিলাম, আর আজ নামতে নামতে কোথায় নেমেছি বলো"

"স্বরটাকে আমি একটু আলাদা ভাবে মানুষ করেছি, অনেক আশা ছিলো ওর ওপর যে ও সবার থেকে আলাদা, নিজের কাজটা ঠিক করে যাবে। না ভাই না ! ও সবি সমান। তার এখন জিদ চেপেছে তাকে মিস্ইউনির্ভাস হতে হবে। তার পর নাকি সে গোটা বিশ্বের শিশুদের সেবা করবে। আর সেই জন্যে সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে ভেনিজূয়েলায় গিয়ে পড়ে রয়েছে কারন ওখান থেকে নাকি বছরে চার- পাঁচটা মিস্ইউনির্ভাস হয়। এবার তুমিই বল কি করে কি হবে লেখাপড়াতে"। বলে কিছুক্ষন কেমন চুপ চাপ হয়ে গেলেন। জানালার বাইরে উদাস হয়ে তাকিয়ে রইলেন। বুঝলাম স্বরসতীর ব্যবহারেই সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছেন। ধীরে ধীরে আবার বলতে লাগলেন-

"যাদের বাবার অবস্থায় এরকম ছেলেপুলেরা আর কত ভালো হবে। কর্তা এখন গাঁজা- কল্কে ছেড়ে বার আর নাইট ক্লাব ধরেছে। কথায় তো কেউ হারাতে পারবে না, বলে ধারাবাহিকতায় নাকি চরিত্রের প্রধান শক্তি" দিদির গলায় হতাশার স্বরটা ভীষন প্রকট হয়ে উঠলো। আমি নিজের সামান্য বুদ্ধি দিয়ে চেষ্টা করলাম সেটা কিছুটা কাটাতে, বললাম-

"আচ্ছা কলকারখাতে তো আর তোমার পরিবারের কেউ নেই কিন্তু সেখানেও তো দেখছি রোজ একটার পর একটা তালা পড়ছে, শিল্প প্রায় অচল, তাহলে বলো"

"মিথ্যে কথা বলবো না, বিশুটা সত্যি ভালো ছেলে, ভীষন পরিশ্রমি" বুঝলাম বিশ্বকর্মা কে আদর করে ওই নামেই ডাকে। উনি বলে গেলেন-

"সেদিন ওদের বাড়ির ছাদে গিয়ে দেখি এক কোনে ও চোখে একটা বিরাট ম্যগ্নিফাইং গ্লাস লাগিয়ে ন্যানোটেক্নোলজির বই পড়ছে। জিজ্ঞেস করাতে বললো এখন নাকি সব বড় বড় জিনিস বাতিল হয়ে গিয়ে ন্যানোতে ঠেকেছে, তাই নিজেকে আপডেট্ করছে। তা এবার তুমিই বলো ও কখন ওই সব পুরোনো কলকারখানাগুলোর পেছনে সময় দেবে"। আমি একটা কিছু জিজ্ঞেস করতে গেলাম কিন্তু তার আগেই তিনি বলতে লাগলেন-

“আসলে কি জানো আমরা যদি সবাই নিজের কাজটা ঠিক ঠাক ভাবে করে যাই তাহলে আরে এত চিন্তা থাকে না। তোমাকে একটা কথা বলবো একটু ভেবে দেখবে ভাই” ভীষন উৎসাহ ও আগ্রহ নিয়ে বললাম-

“নিশ্চয় নিশ্চয়, আপনি বলুন দিদি”

“তোমরা না আমার এই অকর্মন্য ছেলেমেয়ে গুলোর পেছেনে, আমার সংসারের পেছনে বছরের পর বছর এত টাকা পয়সা খরচ করো না। ওই গুলো অন্য ভালো কাজে লাগাও” বুঝতে পারলাম না কি ভাবে আমার রিয়্যাক্ট করা উচিত।

“এই দেখো কথায় কথায় ভুলেই গেছি, আমাকে এই স্টেশনেই নাবতে হবে”

ট্রেনটা দাঁড়াতেই উঠে দাঁড়ালেন দিদি, তার পর দু- এক পা এগিয়ে গিয়ে গেটের কাছাকাছি পৌঁছানোর পরেই দেখলাম কোথায় যেন মিলিয়ে গেলেন। আমি মুখ তুলে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম স্টেশনটার নাম ‘লরেল্’।

********* *********